পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও বামফ্রন্টের কৃষিনীতি

ভূমিসংস্কারই সাফল্যের একমাত্র কারণ, অথবা ভূমিসংস্কারের কোনও অবদানই নেই— দুইই হল রাজনৈতিক বক্তব্য, গবেষণাভিত্তিক বিচার নয়। লিখেছেন **অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৈত্রীশ ঘটক**

কার্যকারণ যাই হোক না কেন, বামফ্রন্ট আমলে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প, উচ্চশিক্ষা ও আরও অনেক বিষয়ে ভারতের অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। সবেধন নীলমণি হল কৃষিতে সাফল্য। সম্প্রতি তর্ক উঠেছে এই সাফল্যের কতটা সত্যি আর কতটা সরকারি পরিসংখ্যানের অতিরঞ্জনের ফল; আর যেটুকু সাফল্য সত্যিই ঘটেছে, তাতে বামফ্রন্টের কৃষিনীতি বিশেষত অপারেশন বর্গা ও সীমিত ভূমি বণ্টনের আদৌ কোনও ভূমিকা আছে কি না। এই সমালোচনা কি নিন্দুকের যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' জাতীয়? না কি সত্যিই গবেষণায় পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে বামফ্রন্টের কৃষিসংস্কার নীতির প্রভাবের কোনও প্রমাণ মেলেনি? এ বিষয়ে আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যান এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৮টি গ্রামে করা একটি সমীক্ষার ফলাফল ব্যবহার করে যে গবেষণা করেছি তার ভিত্তিতে লেখা এই প্রবন্ধ।

১) উৎপাদনশীলতা কি সত্যিই বেড়েছে, নাকি তা কেবলই পরিসংখ্যানের অতিরঞ্জন?

প্রথম প্রশ্ন, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিতে উৎপাদনশীলতা কতটা বেড়েছে। কেউই অস্বীকার করেন না যে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিতে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির হার বেড়েছে। এই রাজ্যের আগের অবস্থা বা প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির সঙ্গে তুলনা করলে, অন্তত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এই বৃদ্ধির হার বেশ চোখে পড়ার মতো। ধরা যাক ধান চাষের উৎপাদনশীলতার কথা। ১৯৬৯ ও ১৯৭৮ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ধান চাষের উৎপাদনশীলতা বেড়েছিল মোট ৯ শতাংশের কিছু বেশি। ১৯৭৯ ও ১৯৯৩ সালের মধ্যে মোট বৃদ্ধির হার ৬৮ শতাংশ। প্রতিবেশী বাংলাদেশে ১৯৬৯ ও ১৯৭৮-এর মধ্যে বৃদ্ধির হার হল ১১ শতাংশ, ১৯৭৯ ও ১৯৯৩-এর মধ্যে ৪৮ শতাংশ।

দুটি বছরের মধ্যে তুলনা না করে যদি ১৯৭৯ ও ১৯৯৩-এর মধ্যে প্রতিটি বছরের পরিসংখ্যান নিয়ে বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধির হার গণনা করা যায়, তুলনামূলক ছবিটি প্রায় একই রকম দাঁড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ের মধ্যে বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধির হার হল ৪.১% আর বাংলাদেশে ২.৮%। কোনও কোনও গবেষকের হিসাব অনুযায়ী (যেমন অভিজিৎ সেন ও রঞ্জা সেনগুপ্ত, ১৯৯৫) আশির দশকে বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধির হার এর চেয়ে অনেক বেশি, কেননা তাঁরা ১৯৮১ সাল থেকে বৃদ্ধির হার গণনা করেছেন এবং ওই বিশেষ বছরটিতে খরার জন্য পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনশীলতা ছিল অনেকটা কম। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ ও ১৯৯৩ সালের মধ্যে বাৎসরিক চক্রবৃদ্ধির হার আমাদের গণনায় যা ধরা পড়েছে, সরকারি পরিসংখ্যানের অতিরঞ্জনের সম্ভাবনায় চিন্তিত গবেষকদের (যেমন জেমস বয়েস, হরিশ গাজদার ও সুনীল সেনগুপ্ত) হিসেবও তার খুব কাছাকাছি (শর্মিলা বসু ২০০০)।

অভিজিৎ সেন ও রঞ্জা সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন যে তিনটি বছর (১৯৮১, ৮৩, ৮৪) ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রকের Comprehensive Cost of Production Studies থেকে ধান চাষের উৎপাদনশীলতার যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি পরিসংখ্যানের প্রায় কোনও তফাত নেই। ব্যতিক্রমী ওই তিনটি বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের ধানের উৎপাদনশীলতা রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যানের থেকে বেশি ছিল।

আরও বড় কথা, রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে আশির দশকে উন্নয়নের হার যে চোখে পড়ার মতো বেড়েছে তা কেবল উৎপাদনশীলতাতেই নয়, অন্যান্য নানা মাপকাঠিতেও ধরা পড়েছে। যেমন গৎ দত্ত ও সেনগুপ্ত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে বা এন এস এস) পরিসংখ্যান ব্যবহার করে দেখিয়েছেন, দারিদ্র সীমার নীচের জনসংখ্যা ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ৫৬ শতাংশ, আর সারা ভারতে ছিল ৫০ শতাংশ, ১৯৯২ সালে তা কমে পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়ায় ২৮ শতাংশ এবং সারা ভারতে ৪৩ শতাংশ।

২) কৃষির উৎপাদনশীলতায় অপারেশন বর্গা বা ভূমিবণ্টনের প্রভাব কতটা হওয়া সম্ভব?

যাঁরা মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের গড় উৎপাদনশীলতার উপর অপারেশন বর্গা বা ভূমি বণ্টনের খুব একটা বড় প্রভাব পড়ার কথা নয় (গজদার-সেনগুপ্ত) তাঁদের প্রধান যুক্তি, মোট কৃষিজমির খুব অল্প অংশই বর্গা বা ভূমিবণ্টনের আওতায় পড়ে। বামফ্রন্টের আমলে মোট কৃষিজমির ৩ শতাংশের বেশিতে ভূমি বণ্টন ঘটেনি এবং অপারেশন বর্গার ফলে যে প্রায় সাড়ে চোদ্দো লক্ষ বর্গাদার নথিভুক্ত হয়েছেন তাঁরা মোট কৃষিজমির মাত্র আট শতাংশের কিছু বেশি জমিতে চাষ করেন। এ বিষয়ে আমাদের দুটি বক্তব্য আছে।

প্রথমত, অপারেশন বর্গার প্রভাব কেবল নথিভুক্ত বর্গাদারদের ওপরেই হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে অ-নথিভুক্ত বর্গাদারদের মোট সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই সংখ্যা কেউই নগণ্য বলে উড়িয়ে দেন না। ১৯৯৫ সালে আমরা চারটি জেলার (বর্ধমান, বাঁকুড়া, মালদহ এবং মেদিনীপুর) ৪৮টি গ্রামে গ্রামপ্রতি দশ জন হিসাবে মোট ৪৮০ জন ভাগচাষিকে নিয়ে এক সমীক্ষা করি। এর থেকে জানা যায় যে অপারেশন বর্গার ফলে অ-নথিভুক্ত বর্গাদারদেরও উচ্ছেদ করা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। উচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দিলে পঞ্চায়েতের সহায়তায় তাঁরা সহজেই নথিভুক্ত হতে পারেন। তা ছাড়া অপারেশন বর্গার ফলে উভয়েরই ফসলের ভাগ গড়ে বেড়েছে যদিও নিঃসন্দেহে নথিভুক্ত বর্গাদারেরা লাভবান হয়েছেন বেশি। তা ছাড়া অপারেশন বর্গার পরে অনেক ক্ষেত্রে জমির মালিক ভাগচাষিকে জমির একটি অংশ দিয়ে দিয়েছেন পুরো জমিতে বর্গা রেকর্ডিং না করার বিনিময়ে (গ্রামে যাকে বলে জমি 'মিউচুয়াল' হয়ে যাওয়া)। অনেক ক্ষেত্রে আবার জমির মালিক (বিশেষত যাঁরা গ্রামে বাস করেন না) বর্গাদারদের অল্প দামে জমি বেচে দিয়েছেন। বিকাশ রাওয়াল (১৯৯৭) বাঁকুড়া জেলার দুটি গ্রামে সমীক্ষা করে দেখেছেন যে ১৯৭৭ সালের পরে এই দুটি গ্রামে মোট কৃষি জমির ৩০%-এর বেশি কেনাবেচা হয়। সমসাময়িক কালে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনা করলে এটি খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আরও উল্লেখ্য যে, ক্রেতাদের অধিকাংশই হলেন ক্ষুদ্রচাষি ও বর্গাদার; আর বিক্রেতাদের অধিকাংশ হলেন বৃহৎ জমির মালিক

১৯৯৫ সালে আমরা চারটি জেলার ৪৮টি গ্রামে গ্রামপ্রতি দশ জন হিসাবে মোট ৪৮০ জন ভাগচাষিকে নিয়ে এক সমীক্ষা করি। এর থেকে জানা যায় যে অপারেশন বর্গার ফলে অ-নথিভুক্ত বর্গাদারদেরও উচ্ছেদ করা খুবই শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

বা সেই সব জমির মালিক, যাঁরা গ্রামে থাকেন না। রাওয়ালের মতে, এ ধরনের জমি হাতবদল প্রধানত সম্ভব হয় অপারেশন বর্গা ও ভূমি বণ্টনের ফলে জমির মালিকদের কাছে জমির দাম পড়ে যাওয়ার ফলে।

দ্বিতীয়ত, যদি মেনে নেওয়া যায় অপারেশন বর্গা ও ভূমি বণ্টনের ফল বিচার করতে গেলে শুধু নথিভুক্ত বর্গাদার বা যাঁরা বণ্টিত জমি পেয়েছেন তাঁদের দেখলে চলবে না, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায়, মোট কত শতাংশ জমিতে এর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রধান সমস্যা হল যে, ১৯৭৭ সালের আগে মোট জমির কত শতাংশ ভাগচাষের আওতায় পড়ত (বা, পশ্চিমবঙ্গে মোট কত ভাগচাষি আছেন) তা নিয়েও বিতর্ক আছে। এন এস এস-এর ২৬তম রাউন্ড থেকে জানা যায়, ১৯৭১ সালে রাজ্যের মোট জমির ১৮ শতাংশ ভাগচাষের আওতায় পড়ত। কিন্তু গবেষকদের মতে (যেমন, প্রণব বর্ধন, ১৯৭৬; লক্ষ্মীনারায়ণ ও ত্যাগী, ১৯৭৭) ভাগচাষের গুরুত্ব এর থেকে খানিক বেশিই হওয়ার কথা, কারণ ভাগচাষ সংক্রান্ত নানা আইন দেশে চালু হওয়ার পর থেকে অনেক জমিতে ভাগচাষ হলেও তা সমীক্ষকের কাছ থেকে গোপন করা হয়। ধরা যাক, ১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিজমির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ভাগচাষের আওতায় পড়ত। জেমস বয়েস তাঁর ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত দুই বাংলার কৃষির উপর লেখা প্রামাণ্য বইতে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এই অঞ্চলের মোট জমির এক-ষষ্ঠাংশ থেকে এক চতুর্থাংশ ভাগচাষের আওতায় পড়ত।

গজদার ও সেনগুপ্ত কিন্তু তাঁদের প্রবন্ধে লিখেছেন, অপারেশন বর্গা চালু হওয়ার সময় এন এস এস এর ৩৭তম রাউন্ড (১৯৮২) অনুযায়ী মোট জমির মাত্র ৭ শতাংশ ভাগচাষের আওতায় ছিল। দুটি কারণে এই পরিসংখ্যানটি অপারেশন বর্গার প্রভাব বিচারের জন্য উপযুক্ত নয়। প্রথমত, গজদার ও সেনগুপ্ত এই একই প্রবন্ধে লিখেছেন, নথিভুক্ত বর্গাদারেরা নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় মোট জমির ৮ শতাংশ চাষ করতেন। তা হলে কি ১৯৮২ সালের পরে ভাগচাষ আবার বেড়েছে? অ-নথিভুক্ত বর্গাদারেরাই বা গেলেন কোথায়? দ্বিতীয়ত, ১৯৮২ সালের পরিসংখ্যানটি অপারেশন বর্গা শুরু হওয়ার প্রায় চার বছর পরের। যেখানে ভারতে ভাগচাষ-সম্পর্কিত পরিসংখ্যানের মূল সমস্যাই হল, নানা আইনের কারণে ভাগচাষ গোপন করার প্রবণতা (Under-reporting), সেখানে দেশের ভাগচাষ-বিষয়ক আইন প্রয়োগের সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা শুরু হওয়ার তিন চার বছর পরে করা সমীক্ষায় এই সমস্যাটি অনেক বেশি পরিমাণেই হওয়ার কথা।

আর একটি ব্যাপার হল, ভাগচাষ মূলত ধানচাষের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। মোট কর্ষিত জমির ৭০ শতাংশের কিছু বেশিতে ধানচাষ হয়, আর নানা সমীক্ষায় দেখা গেছে (শঙ্করকুমার ভৌমিক, ১৯৯৩), ভাগচাষের মোট জমির ৯০ শতাংশের কিছু বেশি অংশে ধানচাষ হয়। আমাদের আলোচনা যেহেতু ধানচাষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হার নিয়ে, ধানচাষের মোট জমিতে অপারেশন বর্গা শুরুর আগে ভাগচাষের উপস্থিতি এক-পঞ্চমাংশের বেশিই হওয়ার কথা।

জন হ্যারিস (১৯৯৩) বীরভূমের দুটি গ্রামে গবেষণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আশির দশকের পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনশীলতা যেটুকু বেড়েছে তা সবুজ বিপ্লবের বিলম্বিত আগমনেরই ফল। এর দুটি মূল উপাদান: (১) উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের প্রসার ও (২) ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিনিয়োগের ফলে ক্ষুদ্র জলসেচের দ্রুত বৃদ্ধি। ১৯৯০ সালে মোট কর্ষিত জমির কেবল ১২ শতাংশে এবং মোট ধানজমির ১৮ শতাংশে বোরো ধানের চাষ হত। আর ক্ষুদ্র জলসেচ? রাজ্য সরকারের যে Census of Minor Irrigation Scheme (১৯৮৮) হ্যারিস উল্লেখ করেছেন, তা থেকে জানা যায়, নিট কর্ষিত জমির মাত্র ১৫% ক্ষুদ্র জলসেচের আওতায় পড়ত। এর অর্থ এই নয় যে আমরা উচ্চ ফলনশীল বীজ বা ক্ষুদ্র সেচের প্রভাব অস্বীকার করছি। এই প্রভাব অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মোট কৃষিজমির ১১%-এর বেশিতে ভূমি বণ্টন ও বর্গা হয়নি বলে রাজ্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে এদের প্রভাব একেবারেই নগণ্য হবে এ কথাও মানা যায় না।

সবুজ বিপ্লবের 'বিলম্বিত আগমনের' প্রভাব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ধানচাষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ব্যাখ্যা করা গেলেও বাকি এক-তৃতীয়াংশের বেশি ব্যাখ্যার বাইরে থেকে যায়।

৩) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অপারেশন বর্গার প্রভাব কতখানি?

এ বার আসা যাক আমাদের গবেষণার মূল বিষয়ে। আশির দশকে ধানচাষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অপারেশন বর্গার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা কতটা? এই প্রশ্নের উত্তরের প্রধান সমস্যা হল, অপারেশন বর্গা বাদ দিয়ে এই সময়ে রাজ্যে অনেক কিছু ঘটছিল (যেমন, উচ্চ ফলনশীল বীজ বা সেচের প্রসার)। একটি উপায় প্রতিবেশী কোনও অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা, যেখানে এ ধরনের সংস্কার হয়নি। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া, প্রকৃতি, কৃষিপ্রযুক্তি বা কৃষিব্যবস্থার দিক দিয়ে অনেকটাই এক রকম। আগেই বলেছি, আলোচ্য সময়সীমার মধ্যে (১৯৭৯-১৯৯৩) দুটি অঞ্চলেই উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির হার ২০ শতাংশ মাত্রা বেশি (বাংলাদেশে বৃদ্ধির হার ৪৮%, পশ্চিমবঙ্গে ৬৮%), যা এই রাজ্যের মোট বৃদ্ধির এক-তৃতীয়াংশের মতো। এ সময় বাংলাদেশে বোরো চাষের হার ও সরকারি সেচের প্রসার তুলনায় বেশিই হয়েছে, সবুজ বিপ্লবের প্রভাবও পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বেশি বই কম নয়। এতে অবশ্যই প্রমাণিত হয় না যে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির এই পার্থক্য অপারেশন বর্গার ফলেই। কিন্তু বর্গা, ভূমি বণ্টন বা পঞ্চায়েতি রাজের প্রসার, এই সব সরকারি নীতি বাদ দিলে আর এক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গের 'অতিরিক্ত' উৎপাদনশীলতা ব্যাখ্যা করা যায়   পরিসংখ্যানের অতিরঞ্জন।

মজার ব্যাপার হল, পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, নানা বিষয়ের প্রভাব বাদ দিলেও যে যে জেলায় বর্গা রেকর্ডিং-এর হার বেশি, সেই সেই জেলায় উৎপাদনশীলতার হারও বেশি। পশ্চিমবঙ্গে ধানচাষের উৎপাদনশীলতা বিষয়ক পরিসংখ্যান যদি সব জেলায় একই হারে অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে, তা হলে এর ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন জেলায় যদি বিভিন্ন মাত্রায়ও অতিরঞ্জন ঘটে থাকে তা হলেও এর ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ তার সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় বর্গা রেকর্ডিং হারের সম্পর্ক থাকবে কেন?

নানা দিক থেকে বিচার করে আমরা অপারেশন বর্গার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের পরিমাণ পাচ্ছি ৭ থেকে ২০ শতাংশ। অপারেশন বর্গা শুরু হওয়ার আগে যে জমি ভাগচাষের আওতায় পড়ত, তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অপারেশন বর্গার গড় প্রভাব হল ২০ থেকে ৩০ শতাংশ। ভাগচাষের কারণে উৎপাদনশীলতা কতটা কম হতে পারে, তা নিয়ে নানা দেশে যে গবেষণা হয়েছে তার ফলাফলের সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধানের ফলাফল খুবই তুলনীয়।

৪) সবুজ বিপ্লবের 'বিলম্বিত আগমনের' প্রভাব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ধানচাষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ব্যাখ্যা করা গেলেও বাকিটা ব্যাখ্যার বাইরে থেকে যায়। আমাদের গবেষণায়, মোট বৃদ্ধির ৭-২০ শতাংশ অপারেশন বর্গার ফল হিসাবে চিহ্নিত করেছি। বাকিটা হল অন্যান্য সরকারি নীতির (পঞ্চায়েতি রাজ, ভূমি বণ্টন ইত্যাদি) প্রভাব।

পরিসংখ্যানভিত্তিক আমাদের এই গবেষণায় এটুকুই জানা যায়। 'পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্যে কেবল ভূমি সংস্কারই দায়ী' অথবা 'পশ্চিমবঙ্গের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে অপারেশন বর্গা ইত্যাদি নীতির কোনওই অবদান নেই' -দুই-ই হল রাজনৈতিক বক্তব্য মাত্র, গবেষণাভিত্তিক বিচার নয়।

সূত্র:

১. **অভিজিৎ ভি বানার্জি, পল গার্টলার ও মৈত্রীশ ঘটক (১৯৯৮),** *এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড এফিশিয়েন্সি: দি ইকনমিক্স অব অ্যাগ্রারিয়ান রিফর্ম।* ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এম আই টি) ওয়ার্কিং পেপার ৯৮-২২।

২. **অভিজিৎ সেন ও রঞ্জা সেনগুপ্ত (১৯৯৫),** *দ্য রিসেন্ট গ্রোথ ইন এগ্রিকালচারাল আউটপুট ইন ইস্টার্ন ইন্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ওয়েস্ট বেঙ্গল।* কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস-এ 'পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষি কাঠামো' সম্পর্কিত ওয়ার্কশপে পঠিত গবেষণাপত্র।

৩. **এইচ লক্ষ্মীনারায়ণ ও এস ত্যাগী (১৯৭৭),** *টেন্যান্সি: এক্সটেন্ট অ্যান্ড ইন্টার স্টেট ভেরিয়েশনস।* ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি (ই পি ডব্লিউ), ২৮ মে।

৪. **জন হ্যারিস (১৯৯৩),** *হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল?* ই পি ডব্লিউ, ১২ জুন।

৫. **জেমস বয়েস (১৯৮৭),** *অ্যাগ্রারিয়ান ইমপাস ইন বেঙ্গল: ইনস্টিটিউশনাল কনস্ট্রেন্টস টু টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ।* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৬. **প্রণব বর্ধন (১৯৭৬),** *ভেরিয়েশনস ইন এক্সটেন্ট অ্যান্ড ফর্মস অব এগ্রিকালচারাল টেন্যান্সি: অ্যানালিসিস অব ইন্ডিয়ান ডেটা অ্যাক্রস রিজিয়নস অ্যান্ড ওভার টাইম।* ই পি ডব্লিউ, ১১ ও ১৮ সেপ্টেম্বর।

৭. **বিকাশ রাওয়াল (১৯৯৭),** *অ্যাগ্রারিয়ান রিফর্ম অ্যান্ড ল্যান্ড মার্কেটস: এ স্টাডি অব ল্যান্ড ট্রানজাকশনস ইন টু ভিলেজেস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৭৭-৯৫।* ইন্দিরা গাঁধী ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ (আই জি আই ডি আর), মুম্বই।

৮. **শঙ্কর ভৌমিক (১৯৯৩),** *টেন্যান্সি রিলেশনস অ্যান্ড অ্যাগ্রারিয়ান ডেভেলপমেন্ট: এ স্টাডি অব ওয়েস্ট বেঙ্গল।* সেজ।

৯. **শর্মিলা বসু (২০০০),** *পশ্চিমবঙ্গে কৃষির 'সাফল্য': যেটুকু হয়েছে, কেন হয়েছে।* আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ মার্চ।

১০. **হরিশ গজদার ও সুনীল সেনগুপ্ত (১৯৯৯),** *এগ্রিকালচারাল গ্রোথ অ্যান্ড রিসেন্ট ট্রেন্ডস ইন ওয়েলবিইং ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল;* বি রোগালি, বি হ্যারিস-হোয়াইট ও এস বোস সম্পাদিত 'সোনার বাংলা?' (সেজ) সংকলনে অন্তর্ভুক্ত।

বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-তে এবং ঘটক শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির শিক্ষক